ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 227-237
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.027

ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পর্যালোচনা

মেহেবুব হোসেন, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.11.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

*Social and economic growth largely depends on people's health. Through this paper an attempt has been made to give an idea about the public health condition of Murshidabad district during the colonial era. Many changes were seen in the field of public health and medical care system in India during the period of study. This time the people's health condition of India deteriorated because various contagious and infectious diseases were seen again and again as epidemic form. The situation of Bengal was immensely pathetic. The people of Murshidabad district also experienced with various types of diseases during the period of study. According to various sources the people's health condition of Murshidabad had deteriorated drastically since the beginning of the nineteenth century. The trade city of Cossimbazar and its neighboring urban areas were depopulated by the epidemic cholera, malaria etc. Horrible images of fever, cholera can be seen in the various medical reports, census report, sanitary commission's reports and governmental documents. Western medicines such as allopathic and homeopathy were introduced under the government patronage to combat grim diseases like cholera, malaria, smallpox, kala-azar, plague, etc. This period also saw the conflict of interest between indigenous medical science and western medicine. Government's health policies were conducted in the con*text of imperialist attitude and were basically city centric.

Keywords: Health, Diseases, Colonial, Bengal, Murshidabad.

স্বাস্থ্য এমনই একটা বিষয় যার উপরে মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়লে শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয়। শরীর বিনাশকারী নানান রোগ ব্যাধি বিভিন্ন সময়ে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির সম্মুখীন হয়েছে এবং সেগুলো থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নানান কৌশলও অবলম্বন করেছে। এটা মনে করা হয় যে মানুষ শুরুতে এই বিষয়ে পশুদের অনুকরণ করেছিল।[১] ক্রমে মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটলে আবিষ্কৃত হয় নানান ধরনের প্রতিষেধক ঔষধ। প্রথম প্রথম মানুষ বিভিন্ন গাছ, লতা পাতার মত ভেষজ এবং আধ্যাত্মিক উপায় অবলম্বন করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করত। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা গুলোতে প্রাচীন কাল থেকেই বিকশিত হয়েছিল ভিন্ন চিকিৎসা ধারা।

[১] P.K.. Sanyal, *A Story of Medicine & Pharmacy in India,* Navana Printing Woks Pvt. Ltd., Calcutta, 1964, p. 31-32.

বৈদিক যুগে ভারতে ভেষজ চিকিৎসা আয়ুর্বেদের বিকাশ ঘটেছিল যেটি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোর মধ্যে অন্যতম। আয়ুর্বেদ কথার অর্থ হল আয়ু সম্মন্ধীয় বিজ্ঞান।[২] বেদে এই চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে বর্ণনা আছে। একটা সময় রোগ ব্যাধি ও তার চিকিৎসা ছিল একান্তই ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানান পটপরিবর্তন ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্থানের মাধ্যমে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে রুপান্তরিত হয় এবং জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্রের মাথা ব্যাথা শুরু হয়।

ভারতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস আলোচনা বিভিন্ন দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন বহুমুখী পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তেমনই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল আমুল পরিবর্তন। এই সময়ে কলেরা, ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত ও কালাজ্বরের মত রোগগুলো বারংবার মহামারী হিসেবে দেখা গিয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।[৩] অতীতে এই সমস্ত রোগ গুলো এতটা ভয়াবহ আকারে কখনও দেখা যায়নি। এই সময়ে বাংলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মত রোগ গুলো ছিল বাঙালির নিত্য সঙ্গী। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সমস্ত রোগ ব্যাধি গুলোর বাড়বাড়ন্ত এই সময়ে কেন এত বেশি ছি?- বাংলার পরিবেশ কি এর জন্য দায়ী ছিল, নাকি ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি? - ঔপনিবেশিক সরকার সব সময়ই রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য ভারতীয়দের এবং এখানকার পরিবেশকে দায়ী করে গেছেন। এটা ঠিক যে এই সময়ে বাংলার পরিবেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই সময়ে কেন এখানকার পরিবেশ খারাপ হয়ে পড়লো সেই বিষয়টাকে তাঁরা নানান কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৪] ঔপনিবেশিক সরকার এই সমস্ত রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমি চিকিৎসা পদ্ধতি এলোপ্যাথির প্রচলন করেছিল, প্রচলন ঘটেছিল হোমিওপ্যাথিরও। কিন্তু এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি যথেষ্ট ব্যায় বহুল হবার দরুণ তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। সর্বপরি দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পুনম বালা, ডেভিড আর্নল্ড ও অনিল কুমারের মত ঐতিহাসিকরা ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী মানষিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেছেন।[৫] ভারতীয় প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোর প্রতি ব্রিটিশদের মানসিকতা শুভ ছিলনা। যদিও কোম্পানি শাসনের শুরুর দিকে উইলিয়াম জোন্স প্রমুখদের উদ্যোগের কারণে প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও ভারতীয় ভেসজ দ্রব্যাদির গুনাগুন বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম জোন্স নিজে 'Botanical Observation of Select Indian Plants' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[৬] এই বিষয়ে কিছুটা গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কোম্পানি সরকার ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন প্রবর্তনের সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকার কিছু অংশ

---

[২] সুব্রত পাহাড়ি, *উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা বাবস্থার স্বরূপ,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, p. 2.

[৩] Arabinda Samanta, *Living With Epidemics in Colonial Bengal,* Routledge, New York, 2018.

[৪] Mehebub Hossain, 'Health and Environment in the Nineteenth Century Murshidabad', *Proceeding of the Bihar History Congress (2022),* Bhagalpur, p. 224.

[৫] See- David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India,* Oxford University Press, Delhi, 1993; Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective,* Sage Publications, New Delhi, 1991.

[৬] সুব্রত পাহাড়ি, *op. cit.,* p. 28.

এদেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ব্যায় করার কথা ভেবেছিল। যাইহোক এই প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিবাদের কারণে।

ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে প্রেসিডেন্সি বিভাগ তথা বাংলার অন্যান্য জেলা গুলোর মত এই জেলাতেও কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও গুটিবসন্তের মত রোগ গুলো ছিল জনস্বাস্থ্যের মূল সমস্যা। তথাপি জনগনের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে সরকারি উদাসীনতাও লক্ষ্য করা গেছে। কখনও কখনও পরিবেশ গত কারণ যেমন নদীর গতিপথের পরিবর্তন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মত বিষয় গুলো জেলার জনস্বাস্থ্যকে সমস্যার সম্মুখীন করেছিল।[৭] ভাগীরথী নদীর পূর্ব প্রান্তের বাগড়ি অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হত ফলে জল জমে থাকার কারণে জ্বর ব্যাধি ও বিভিন্ন চর্ম রোগ দেখা যেত। এই অঞ্চলটিতে যেমন বেশ কিছু নদী রয়েছে তেমনই রয়েছে অসংখ্য বিল যেগুলোর বেশিরভাগই নদীর পরিত্যক্ত খাত, তাই বর্ষার সময় এই এলাকাটিতে জল জমে থাকতো। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জেলার মানুষ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।[৮] যদিও ইংরেজ শাসনের শুরুতে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় জেলার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ উজাড় হয়ে গিয়েছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল বলে কবিতা রায় উল্লেখ করেছেন[৯] এবং এই সময়ের বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র গুলোতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য ব্রিটিশ সৈন্যের মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। যদি আমরা এই দুর্ভিক্ষের সময়কালটার কথা না বলি তাহলে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত জেলার পরিবেশ মোটামুটি ভাবে স্বাস্থ্যকর ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

একটু পিছনের দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে যে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই কাশিমবাজারে একে একে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি ও আর্মেনিয়ানরা বানিজ্য কুঠি নির্মাণ করেছিল। পলাশির যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ১৭৬৫ সালে বহরমপুরে ব্রিটিশদের সেনানিবাস নির্মাণ এটা প্রমাণ করে যে ওই সময়কালে জেলাঞ্চলের পরিবেশ বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল।[১০] LSS O' Malley এর মতে ১৮১৪ সালে ভাগীরথী নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হলে বানিজ্য কেন্দ্র কাশিমবাজার ও তার আশেপাশের এলাকার মানুষ গুলো ব্যপক ভাবে ম্যালেরিয়া ও কলেরার মত রোগের স্বীকার হয়েছিল। যার ফলে এই সময়ে এই এলাকাটা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। মির্জাপুর, বরানগর এই সমস্ত এলাকা গুলোও আক্রান্ত হয়েছিল।[১১] যদিও ১৮০৩ সালেই একবার কাশিমবাজারে ভয়াবহ আকারে জ্বর ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু এতে কত সংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছিল সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮৩৯ সালে ভাগীরথী নদী যখন পুনরায় গতিপথ পরিবর্তন করে তখন কাসিমবাজার ও তার আশেপাশের এলাকা গুলো পুনরায় অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। ইংরেজদের বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাঁরা এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য বহরমপুর সেনানিবাস

---

[৭] L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1914, p.81.

[৮] Mehebub Hossain, 'Health and Environment in the Nineteenth Century Murshidabad', *Proceeding of the Bihar History Congress (2022),* Bhagalpur, p. 225.

[৯] Kabita Ray, *History of Public Health in Colonial Bengal 1921-47,* Calcutta, K.P. Bagchi & Co., 1998. p. 96.

[১০] B.B. Mukherjee, *Final Report on the Survey and Settlementy Operations in the district of Murshidabad: 1924-32,* Alipur,1938, p.3 ; বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ জেলা গেজিটিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,মুর্শিদাবাদ , ২০০৩. p. ৫০৭.

[১১] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, 'Malaria in Colonial Murshidabad', *Kanpur Philosophers, Vol. IX, Issue II,* 2022, p. 658.

থেকে সাধারণ ব্রিটিশ সেনাদের সরিয়ে নিয়েছিল এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত সেখানে কেবলমাত্র কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সেনা অফিসারই ছিল।[১২]

১৮৫১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে প্রচুর সংখ্যক মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ ডিসপেনসারিতে আসছিল বলে সিভিল সার্জেন A. Kean উল্লেখ করেছেন।[১৩] অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে গ্যাস্ট্রেলের *Geographical and Statistical Accounts of Murshidabad (1860)* গ্রন্থেও। তিনি ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদ শহর ও তার আশেপাশের এলাকা গুলো কলেরা ও ম্যালেরিয়া প্রবন ছিল বলে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় যখন ভাগীরথী নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যেত তখন ভাগীরথী কাশিমবাজারের কাছে অবস্থিত ঝিলের জলকে নিজ দেহে টেনে নিত, শুখার সময়ে নদী প্রায় বদ্ধ জলাশয়ে পরিনত হত তখন নদীর তীরবর্তী এলাকা গুলোতে রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যেত।[১৪] স্থানীয় বাসিন্দারা ঝিলের জলকেই দুর্দশার কারণ বলে মনে করত। আধ-পোড়া মৃত দেহ গুলোকে যখন তাতে ফেলা হত তখন জায়গাটা আরো অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ত। স্যানিটারি কমিশনের প্রথম রিপোর্টে বহরমপুর শহরের স্বাস্থ্য অবস্থার যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে যেসকল এলাকায় ইউরোপিয়ানরা বসবাস করত সেই এলাকা গুলো বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল কেননা ইউরোপীয়ানরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলত। অন্যদিকে স্থানীয় জনগণের বসবাসের এলাকা গুলোতে রোগব্যাধির প্রাচুর্য ছিল। কলেরা রোগটি বহরমপুরে প্রতিবছর দুটি পর্যায়ে নিয়মিত ভাবে দেখা যেত, গ্রীষ্মের শুরুতে যথা- মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে এবং আর একবার শীতের শুরুতে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন ভাগীরথী নদী স্রোতবিহীন হয়ে বদ্ধ জলাশয়ে পরিনত হত।[১৫] ১৮৭০ সালের মার্চে কলেরা প্রথমে বহরমপুরে হালকা ভাবে দেখা যায় এর পর কিছুদিনের মধ্যেই রোগটি গোকর্ণ, দেওয়ানসেরায়, আসানপুর, সুতি, জলঙ্গী, রঘুনাথগঞ্জ, সুজাগঞ্জ ও মানুল্লাবাজারে দেখা যায়। ১৮৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেও জেলায় কলেরা রোগ ৫২৫ জনের প্রাণ কেড়েছিল, এই সময়ে আজিমগঞ্জে কলেরা দেখা দেওয়ার কারণ হিসেবে পচা ইলিশ মাছ ভক্ষণ করাকে দায়ী করা হয়েছিল।[১৬] ১৮৭৩ সালে বাংলায় কলেরা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তার প্রভাব পড়েছিল বিশেষ করে ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের রাঢ় অঞ্চলে। ওই বছরে জেলায় প্রত্যেক মাসেই কলেরা রোগে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং মোট ১৩৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই একই বছরে জেলায় গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।[১৭]

উনিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলায় 'বর্ধমান জ্বর' নামক যে মহামারী দেখা গিয়েছিল সেই জ্বরের প্রভাব মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ছিল। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের কিছু অঞ্চল যেমন কান্দি ও ভরতপুরে এর প্রভাব ছিল বেশি। এই সময় অজয় নদের উত্তরে রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছিল, রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণের সময় যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তা প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল কেননা পর্যাপ্ত

---

[১২] Ibid. p., 659.

[১৩] A. Kean, *Half Yearly Reports of the Government Charitable Dispensaries (Oct- 1851-March 1852),* Carbery Military Orphan Press, Calcutta, 1853, p. 63.

[১৪] L.S.S. O' Malley, *op. cit.*, pp. 81-82.

[১৫] *First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868,* Alipore Jail Press, Calcutta, 1869, pp. 56-57.

[১৬] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal Vol. IX. District of Murshidabad and Pabna,*Trubner & Co., London, 1876. p. 242.

[১৭] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *মুর্শিদাবাদ জেলা গেজিটিয়ার,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩, p. 168.

পরিমাণে কালভার্ট ব্যবহার করা হয়নি, ফলস্বরূপ জমা জলে মশার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল।[১৮] যদিও এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল অনেক আগেই পূর্ব বঙ্গের যশোরে ১৮৩৬ সালে। ওই সময়ে যশোর থেকে মামুদপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণের সময় এক অজানা জ্বরের কবলে পড়ে ১৫০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ক্রমে এই জ্বর নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান, বিরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই জ্বরটিকে অনেকে আবার কালাজ্বরের সাথে তুলনা করেছেন।[19] W.W. Hunter ও মুর্শিদাবাদ জেলায় জ্বর ব্যাধি ও কলেরার প্রকোপ লক্ষ্য করেছেন। তার বিবরনী থেকে সেই সময়ের কাশিমবাজারের জনবিরল অবস্থার কথা পাওয়া যায়। তিনি ভাগীরথীর বদ্ধ হয়ে যাওয়া ধারাটিকে এখানকার মহামারীর বড় কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭১-৭২ সালে জেলায় ১২৯৩০ জন মানুষ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল।[20] এই সময়ের স্যানিটারি কমিশনের তথ্য গুলোতেও মুর্শিদাবাদ জেলায় জ্বর ব্যাধি, কলেরা ও গুটিবসন্তের প্রাদুর্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৩৩,৮৯৬ জন মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল যার মধ্যে ২১,৭৮৮ জন মৃত্যু বরণ করেছিল।[২১] ১৮৭০-৭২ এবং ১৮৮৫ সালে বহরমপুর শহরের বন্যার কারণে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা গিয়েছিল। ১৮৭৬-৭৭ সালে জেলায় ৬৪৫২ জন মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হলে ৩৮০৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালে কলেরায় মারা যান ১১৪৮ জন। এই সময়ে 'বর্ধমান জ্বর' ও কলেরার কারণে জেলায় উচ্চ মৃত্যু জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল। 19th Annual Report of Sanitary Commission for Bengal এর দেওয়া তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদ শহর, বহরমপুরের গোরা বাজার এবং আসানপুরে ম্যালেরিয়া রোগের মৃত্যুর যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে সেটা হল প্রতি ১০০০ জনে যথাক্রমে ৩৩.১৩, ২৯.২০ এবং ৩৬.৭৭ জন।

এই সময়ের আদমশুমারি রিপোর্ট গুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখলে জেলার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত জেলার জনসংখ্যা ১০.৩৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত সময়কালে জেলার জনসংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে ১৮৭২ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতি বছরে জেলায় ০.৩ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জন্মহারের থেকে মৃত্যুহার সামান্য কম হলেও শিশুমৃত্যু ও ম্যালেরিয়া জনিত কারণে মৃত্যুহার ছিল অত্যন্ত বেশি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৭১ শতাংশ, যেখানে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬ শতাংশ হারে। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জেলার জনসংখ্যা ৮.৯৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। একই রকম ভাবে রাজ্যের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ২.৯১ শতাংশ হারে।[২২] জেলার গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা কমলেও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা এই দশকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ম্যালেরিয়া ও সমজাতীয় জ্বরের কারণে মৃত্যুর বার্ষিক গড় হার ছিল ২.৯ শতাংশ। ১৯০৪ সালে বাগড়ী অঞ্চলে বড় আকারে বন্যা হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়। ফসলের যেমন ক্ষতি হয়েছিল তেমনই জল জমে থাকার কারণে রোগের প্রকোপ

[১৮] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, 'Malaria in Colonial Murshidabad', *Kanpur Philosophers, Vol. IX, Issue II,* 2022, p. 659.

[১৯] Ibid.

[২০] W.W. Hunter, *op. cit.,* p. 241.

[২১] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *op. cit.,* p. 168.

[২২] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, *op. cit.,* p. 660; Mehebub Hossain, 'Health and Environment in the Nineteenth Century Murshidabad', *Proceeding of the Bihar History Congress (2022),* Bhagalpur, p. 228.

বেড়েছিল। ১৯০৫ সালে জেলাতে কলেরা রোগ মহামারীর কারণে ৮০০০ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ঠিক তার দুই বছর পরে ১৯০৭ সালে গুটিবসন্ত রোগ মহামারী হিসেবে দেখা গিয়েছিল।[২৩]

'বেঙ্গল ড্রেনেজ কমিটি' ১৯০৬-০৭ সালে জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা তদন্ত করেছিল, জি.ই. স্টুয়ার্ট ও শ্রী এ. এইচ প্রোক্টর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ও প্রাদুর্ভাব বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁরা দক্ষিণে গোরাবাজার থেকে উত্তরে ভাগীরথী বাঁধের রিটায়ার্ড লাইন পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর দুই প্রান্তের ফালি এলাকা, লালগোলা থানা এলাকা, হরিহরপাড়া থানা এলাকা ও ভগবান গোলা থানার কিছু এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁরা ৭০ টি গ্রাম ঘুরে ১২ বছরের কম বয়সী ৪৭৪৪ জন শিশুকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তারমধ্যে ১৯৫২ জনেরই ছিল বর্ধিত প্লীহা (৪১ শতাংশ)। যদিও এই হার ছিল নদীয়া ও যশোহর জেলার তুলনায় কম।[২৪] একই রকম ভাবে লাহোর মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক ডব্লিউ. এইচ. সি. ফরস্টার ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি থানা এলাকা যথা- সুজাগঞ্জ, দৌলতাবাজার, শাহনূর, ভগবানগোলা ও সামসেরগঞ্জে তদন্ত করেছিলেন। তিনিও ১২ বছর পর্যন্ত বয়সী শিশুদের পরিক্ষা করে তিনি বর্ধিত প্লীহার হার নিরূপন করেন। তিনি সর্বাধিক প্লীহা বৃদ্ধির হার খুঁজে পেয়েছিলেন শাহনগরে (৫৫ শতাংশ), আর সর্বনিম্ন ছিল সামসেরগঞ্জে (১ শতাংশ)।[২৫] বিল বা ডোবা সংলগ্ন এলাকায় এই হার ছিল অত্যন্ত বেশি (৮২.৬ শতাংশ)। যদিও ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর উভয় ক্ষেত্রেই প্লীহা বৃদ্ধি ঘটে। ফরস্টার এর তথ্য অনুসারে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল ভাগীরথী ও ভৈরব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং ভাগীরথী ও গোবরানালার মধ্যের অংশে। যদিও তিনি কোনো গ্রামেই চারটির বেশি সংক্রমনের ঘটনা দেখতে পাননি এবং এই সময়ে রোগটি ক্রমশ কমে আসছিল। যদিও মেজর এ. বি. ফ্রাই ফরস্টারের দেওয়া তথ্যের সাথে অনেকক্ষেত্রে একমত হননি। আসলে এখানে একটা কথা মনে রাখাও জরুরী ফরস্টার যে সময়ে তদন্ত করছিলেন সেই সময়ে সমগ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগ সহ মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য কমে গিয়েছিল। এ. বি. ফ্রাই এই সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য অনুসারে জেলার থানা গুলোকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। তাঁর মতে নওদা, আসানপুর, ভগবানগোলা, লালগোলা, মানুল্লাবাজার, হরিহরপাড়া এলাকা গুলো ছিল সর্বাধিক ম্যালেরিয়া প্রবন। এই সকল এলাকা গুলোতে ম্যালেরিয়া ছিল হাইপার-এনডেমিক। তিনি রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণের সাথে ম্যালেরিয়ার যোগসূত্র লক্ষ্য করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। তবে জেলায় ম্যালেরিয়া ছাড়াও ছিল লাইশম্যান-ডোনোভান জ্বর যেটা অনেকটাই আসামের কালাজ্বরের মতই, যক্ষ্মা জ্বর, ফুসফুস- প্রদাহ বা নিউমোনিয়া, হাম, আন্ত্রিক, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি।[২৬]

সি. এ. বেন্টলি তাঁর "Malaria and Agriculture in Bengal" নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক মানুষ ম্যালেরিয়ার কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাইগ্রেট করেছিল। এই রোগটি কিভাবে বাংলার কৃষক ও কৃষিকাজকে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তার লেখায় মুর্শিদাবাদ জেলায় 'ম্যালেরিয়া-কৃষক ও কৃষি সংকট' এর চিতর্ও ফুটে উঠেছে।

---

[২৩] F.C. Clarkson, *Seventh Triennial Report of Vaccination in Bengal,* The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908, p. 7 ; Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, ' Smallpox and Vaccination in Colonial Bengal with Special Reference to Murshidabad (1901-1944)', *Juni Khyat,* January-June 2024. p. 454.

[২৪] L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1914, p.82.

[২৫] Ibid. p. 85.

[২৬] Ibid. p. 89.

যাইহোক শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা বিরাজমান ছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে জেলার জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিছুটা আশার আলো দেখতে পাওয়া যায় এবং সেইসাথে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও কলেরা ও গুটিবসন্ত রোগ গুলোর উচ্চ প্রাদুর্ভাব ছিল এই সময়ে। এই দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি (১১.৯৭) রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে (৮.১৪) ছাপিয়ে গিয়েছিল।[২৭] জন্মহার বা অভিবাসনের হার খুব একটা না বাড়লেও মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছিল। এই সময়ে বাগড়ী অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। জল জমে থাকার সমস্যা কিছুটা দুর করা গেলে ম্যালেরিয়ার মত জ্বর ব্যাধির প্রকোপ কমে যায়, ফলে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হয়। ম্যালেরিয়া প্রবন লালগোলা, ভগবানগোলা ও রানীনগর থানা এলাকার অনেকগুলো জলাভূমি-সংলগ্ন গতিহারা জলপ্রবাহ বর্ষার সময় সচল হয়। ডোমকল, জলঙ্গী থানা এই ঘটনা ঘটে এবং পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়ে ওঠে। যদিও এই সময়ে ম্যালেরিয়ার কারণে হরিহরপাড়ার জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। জিয়াগঞ্জ অঞ্চলের জনসংখ্যাও ৩.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। রেশম শিল্পের অবনতির জন্য এই শিল্পের সাথেই জড়িত বহু মানুষ এই সময় অন্যত্র চলে যায়।[২৮]

বিংশ শতকের শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও বিশ্ব যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করলে বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ বেড়েছিল। গুটি বসন্ত, কলেরা এবং স্প্যানিশ ফ্লু এর ক্ষেত্রে যার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গুটি বসন্ত রোগটি এই শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলায় কয়েক বছর পর পরই মহামারী হিসেবে দেখা গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্প্যানিশ ফ্লু ১৯১৮-২০ সালে ভারত তথা বাংলায় ধ্বংস লীলা চালিয়েছে। ১৯১৯-২০ সালে গুটিবসন্ত মহামারী বাংলায় যথাক্রমে ৩৭০১০ এবং ৩৬১৯০ জনের জনের প্রাণ কেড়েছিল যার হাত থেকে রেহাই পাইনি মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষও।[২৯] ১৯২০ সালের পরে গুটি বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কয়েক বছর কম থাকলেও ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর থেকেই তা আবারও মহামারীর আকার ধারণ করে এবং ১৯২৮ সাল পর্যন্ত যা বাঙালি জাতিকে ভুগিয়েছিল। সি. এ. বেন্টলির Annual Report on the Vaccination in Bengal for the year 1926-27, তথ্যে এটা দেখা যায় যে বাংলার প্রায় সমস্ত জেলা গুলোই এই সময়ে গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি সংক্রমনের স্বীকার হয়েছিল পাবনা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা ও কলকাতা। মুর্শিদাবাদ জেলায় ওই বছর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩১০১ জনের মৃত্যু হয়েছিল।[৩০] ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে বাংলায় গুটিবসন্ত মহামারীর কারণে যথাক্রমে ৪২৫১৪ এবং ৪৩৫৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। বেঙ্গল পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট এর তথ্য অনুসারে এই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সব ঋতুতেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্ষার সময় বাদে বছরের সব সময়েই জেলায় ভ্যাকসিন দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই সময়ে জেলায় অতিরিক্ত ভ্যাকসিনেটর নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯২৮-২৯ বর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩৬৮৩১৫ জনকে ভ্যাকসিন করা হয়েছিল।[৩১] বেঙ্গল পাবলিক হেল্থ রিপোর্টের তথ্য বলছে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত দশ বছর সময়কালে

---

[২৭] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, *op. cit.,* p. 663.

[২৮] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *op. cit.,* p. ১৫৩.

[২৯] Kabita Ray, *History of Public Health in Colonial Bengal 1921-1947,* K P Bagchi & Co, Kolkata, 1998, p. 59.

[৩০] Dr. C.A. Bentley, *Annual Report on Vaccination in Bengal for the Year 1926-27,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1927, p. 7.

[৩১] Dr. C. A. Bentley, *Fourteenth Triennial Report on Vaccination in Bengal,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1930, p.6.

গুটিবসন্ত রোগে মৃত্যু পরিসংখ্যানের দিক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান ছিল কলকাতা ও হাওড়ার পরেই।[৩২] ১৯২৯ সালের পরবর্তী বছর গুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেলেও ১৯৩৬ সালে আবার ভয়াবহ আকারে ফিরে আসে এবং সমগ্র বাংলায় ৪৬২৬৭ জনের মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে এই রোগে মৃত্যুহার বেশি ছিল।[৩৩]

গুটিবসন্তের পাশাপাশি ওই একই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে বাংলায় কলেরা মহামারী আকারে দেখা গেলে মুর্শিদাবাদ জেলায় যথাক্রমে ৩৮৪৪ এবং ৪১০৩ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।[৩৪] এই দুই বছরে জেলায় ১৩৬৪৫১ জনকে কলেরার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল এবং ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল বিতরণ করা হয়েছিল। রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি ছিল জঙ্গিপুর, হরিহরপাড়া, নওদা ও বেলডাঙ্গা থানা এলাকায়।[৩৫] পরবর্তী কয়েক বছরে এই রোগটির প্রকোপ কমে গেলেও ১৯৩৪ এবং ১৯৪৩ সালে আবার এই রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা বেড়েছিল। তবে লক্ষনীয় বিষয় হল শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জেলার জনসংখ্যা ১৯.৬৯ শতাংশ বেড়েছিল, যদিও তা রাজ্যের হারের তুলনায় কম ছিল। জেলার প্রতিটি মহকুমাতেই জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই দশকে স্বাস্থ্য-অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। পরের দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল (বেড়েছিল ৪.৫৯ শতাংশ হারে)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কান্দী মহকুমার মোট জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ৫.৬ শতাংশ। জনসংখ্যার এই নিম্ন বৃদ্ধির সব চেয়ে বড় কারণ ছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর। এছাড়া এই সময়ে জেলায় ম্যালেরিয়া, কলেরা ও ডাইরিয়া জনিত কারণে উচ্চ মৃত্যু, ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দেশভাগ এবং ১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে মুসলিম জনসংখ্যার বহির্গমন এই দশকের জনহ্রাসের মূল কারণ ছিল।[৩৬] ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের রাঢ় এলাকা পূর্ব দিকের বাগড়ী এলাকার তুলনায় চিরাচরিত ভাবে কৃষিতে পশ্চাদপদ হওয়ায় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের আঘাত বিশেষত কান্দি মহকুমা ও জঙ্গীপুরে প্রবল ছিল।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের বছরে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলায় ৬৮৮,৪০৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যেখানে ১৯৪২ সালে ৪২৬৫৭৩ জন প্রাণ হারান এই রোগে। এই সময়ে বাংলায় মোট মৃত্যু সংখ্যার ৩৬.১ শতাংশই ম্যালেরিয়ার কারণে হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া ৩৯৭১৯ জনের প্রাণ কেড়েছিল।[৩৭] পরের বছরে ১৯৪৪ সালে এই রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে সমগ্র বাংলায় ৭৬৩২২০ জন প্রাণ হারান, যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় মৃত্যু হয়েছিল ৪১১০৭ জনের।[৩৮] দুর্ভিক্ষের সময়ের আরো একটি ঘাতক রোগ ছিল কলেরা, এই রোগে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ২১৬৪২৮ জনের মৃত্যু

---

[৩২] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, 'Smallpox and Vaccination in Colonial Bengal with Special Reference to Murshidabad (1901-1944)', *Juni Khyat,* January-June 2024. p. 456.

[৩৩] Ibid., pp. 456-457.

[৩৪] Dr. C. A. Bentley, *Bengal Public Health Report for the Year 1927,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1929, pp. 25-33.

[৩৫]See- Dr. C.A. Bentley, *Bengal Public Health Report for the Year 1928,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1930. P. 30.

[৩৬] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *op. cit.,* p. 153.

[৩৭] M. Jafar, *Bengal Public Health Report for the Year- 1943,* Bengal Government Press, Calcutta, 1947, p. 8.

[৩৮] M. Jafar, *Bengal Public Health Report For the Year 1944,* Bengal Government Press, Alipore, pp. 8-9.

হয়েছিল। সরকারি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির দেওয়া তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় কলেরার কারণে এই বছর ৫০৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। জেলার ১৯০৮ টি গ্রামের মধ্যে ৯৭৬ টি গ্রামে কলেরা রোগী পাওয়া গিয়েছিল। আমাশয় ও ডাইরিয়ার কারণে জেলায় ৭৫৯ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, যদিও এই রোগের উপসর্গ অনেকটাই কলেরার উপসর্গের মতই। গুটি বসন্ত রোগ এই সময়ে জেলায় তেমন ভয়াবহ ছিল না, এই রোগে ১৯৪৩ সালে জেলায় ৩৫ জন এবং ১৯৪৪ সালে ২০৫ জনের মৃত্যুর খবর Bengal Public Health Report এ উল্লেখ আছে।[৩৯] কিন্তু পার্শ্ববর্তী জেলা নদীয়া, ২৪ পরগনা ও কোলকাতায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটাই বেশী ছিল।

চিকিৎসালয়: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জেলায় ৬ টি চিকিৎসালয় এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। এগুলো হল- বহরমপুর হাসপাতাল যেটি সেই সময়ে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসালয় হিসেবে পরিচিত ছিল, মুর্শিদাবাদ নগর চিকিৎসালয়, আজিমগঞ্জ চিকিৎসালয়, কান্দি শাখা চিকিৎসালয়, জঙ্গীপুর শাখা চিকিৎসালয় ও লালগোলা চিকিৎসালয়।[৪০] এগুলো ছাড়াও ক্ষুদ্রতর চিকিৎসালয় হিসেবে উনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে জেলায় আরো বেশ কয়েকটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সেগুলো হল বেলডাঙ্গা, দৌলতাবাদ, মরিচা, হরিহরপাড়া ও পাচথুপি। এগুলোতে মূলত এলোপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা হত, যদিও আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব ছিল। স্ত্রী ও প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসার জন্য আলাদা করে তেমন ব্যবস্থা ছিল না এই হাসপাতাল গুলোতে। আর এই সকল চিকিৎসালয় গুলো চলত স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করে কেননা সরকারি বরাদ্দ ছিল খুবই সীমিত। এ প্রসঙ্গে আমরা লালগোলার রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, আজিমগঞ্জের রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর, কান্দির পাইকপাড়া এস্টেটের মহারাণী ও কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহের পর্যাপ্ত অনুদান। এছাড়াও এই সময়ে জেলায় লন্ডন মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'লন্ডন মিশন হাসপাতাল' নামে একটি চিকিৎসালয় জনগণের সেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।[৪১] বিশেষ করে স্ত্রী ও মায়েদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তার মিশ লুসি নিকলসন ও এলিস হকারের উপস্থিতি এই হাসপাতালকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার জন্য জিয়াগঞ্জের জমিদার রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ন সিংহ ৪২ বিঘা জমি দান করেছিলেন।[৪২]

যদিও জেলার বেশিরভাগ মানুষ সেই সময়ে দেশজ ও লোক-চিকিৎসার উপরেই বেশি নির্ভরশীল ছিল। অসুখ বিসুখ হলে মানুষ সেই সময়ে বিভিন্ন ভেসজ দ্রব্য সেবন, ঝাড়ফুঁক ও টোটকা তাবিজের ব্যবহার করত। জেলায় বেশ কয়েকজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ভেসজ মতে চিকিৎসা করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উনিশ শতকের বাংলার বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধর রায় মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদে চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুখ্যাতি মুর্শিদাবাদ ও বাংলার সীমানা পেরিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর কাছে থেকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যরা ভারতের নানা প্রান্তে চিকিৎসা ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত, ইন্দুভূষন ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র

---

[৩৯] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, ' Smallpox and Vaccination in Colonial Bengal with Special Reference to Murshidabad (1901-1944)', *Juni Khyat,* January-June 2024. p. 458; Major M. Jafar, *Bengal Public Health Report for the Year 1944,* Bengal Secretariat Book Depot, Alipore, p.7.

[৪০] W.W. Hunter, *op. cit.,* pp. 246-249.

[৪১] Ashis Kumar Mondal, *Murshidabad Jelai Christian Missionarider Karjokolap o Abodan*, Silponagori Prakasani, Berhampore, 2014, p.56.

[৪২] Ibid. p. 57.

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীচরণ ও জতিশচন্দ্রের সুখ্যাতিও কম ছিল না। ১৮৭২ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় কবিরাজের সংখ্যা ছিল ২২৫৮ জন।[৪৩] এই সময়ে কবিরাজরাই জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন।

উপসংহার: মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া, কলেরা, গুটিবসন্ত ও কালাজ্বরের মত অসুখ গুলোই ছিল প্রধান এবং এগুলো প্রায় প্রতি বছরই দেখা যেত। কখনও কখনও এই অসুখ গুলো হাইপার-এনডেমিক আবার কখনও মহামারী হিসেবে এসে জেলার জনস্বাস্থ্যকে সমস্যার সম্মুখীন করেছিল। এই সকল ব্যাধি ছাড়াও আমাশয়, বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, কনজাংটিভাইটিস, ফুসফুসের রোগ ও হাঁপানির মত অসুখগুলো বিভিন্ন বছরের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি রিপোর্ট গুলোতে উঠে এসেছে এবং এই রোগগুলো সবসময়ই দেখা যেত। কালাজ্বরের প্রাবল্য জেলায় অন্যান্য অসুখ গুলোর তুলনায় কম থাকলেও ১৯২০ সালের পর থেকে জেলার বিভিন্ন চিকিৎসালয় গুলোতে এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়েছিল এবং সাথে বেড়েছিল মৃত্যু সংখ্যাও। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরটি বাংলায় ক্রমশ মহামারীর পর্যায় থেকে এনডেমিক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, যদিও কোনো কোনো বছরে এই জ্বরে উচ্চ মৃত্যু লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন মেডিক্যাল রিপোর্ট গুলোতে। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে আবারও ম্যালেরিয়া বাঙালি জাতিকে পঙ্গু করেছিল। এই সমস্ত রোগ ব্যাধি গুলোর বাড়বাড়ন্তের জন্য বাংলার পরিবেশ যেমন দায়ী ছিল তেমনই দায়ী ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের জনস্বাস্থ্য নীতি, ভারতীয়দের স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব ও নানান কুসংস্কার। ঔপনিবেশিক সরকারের জনস্বাস্থ্য নীতি সেই সময়ের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রত্যহ সমালোচিত হয়েছিল, রোগ ব্যাধি দমনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। জেলায় যে সব চিকিৎসালয় গুলো ছিল সেগুলো মূলত ছিল শহরকেন্দ্রিক এবং সেগুলোতে পরিষেবা প্রদান করার মত যথেষ্ট পরিকাঠামোও ছিল না। মানুষ তাই নির্ভর করত বিভিন্ন ধরনের লোক-চিকিৎসা যেমন কবিরাজি, ফকিরি, টোটকা ও ঝাড়ফুঁক এর মত চিকিৎসার উপরে। এলোপ্যাথি চিকিৎসা ছিল যথেষ্ট ব্যায়বহুল এবং সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। কখনও কখনও এক ডোজ কুইনাইন কিনতে গিয়ে বাংলার ক্ষেত মজুরদের পাঁচ দিনের আয় চলে যেত।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) Andrew Cuningham and Bride Andrews (ed.), *Western Medicine as Contested Knowledge, Manchester University Press,* Manchester, 1997.
2) Anil Kumar, *Medicine and the Raj: British Medical Policy In India 1835-1911*, Sage, New Delhi, 1998.
3) Amiya Kumar Bagchi & Soman Krishna (ed.) *Maladies, Preventives and Curative Debates in Public Health in India*, Tulika Books, New Delhi, 2005.
4) Arabinda Samanta, *Living with Epidemics in Colonial Bengal*, Routledge, 2018.
5) Biswamoy Pati, Mark Harrison (ed.), *Health Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India*, Orient Longman, Hyderabad, 2001.
6) David Arnold, *Imperial Medicine and Indigenous Societies*, Oxford University Press, New Delhi, 1989.
7) Deepak Kumar & Raj Sekhar Basu, *Medical Encounters In British India*, Oxford University Press, New Delhi, 2013.

[৪৩] H.H Risley, *The People of India, 1915*, New Delhi, Reprint 1991, pp. 362-364; Census of India 1872.

8) D.P Chattopadhyaya & O.P. JAGGI ed. *Medicine in India: Modern Period* Vol. IX, of *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization* Part 1, Oxford University Press, New Delhi, 2011.
9) Gopaul Chandra Roy, *The Causes, Symtoms and Treatment of Burdwan Fever or The Epidemic Fever of Lower Bengal,* London, 1876.
10) Gautam Bhadra, *Some Socio- Economic Aspects of the Town of Murshidabad, 1765-1973* (an unpublished thesis, J.N.U, 1973).
11) Srilata Chatterjee, *Western Medicine and Colonial Society*, Primus Books, Delhi, 2017.
12) Kabit Ray, *History of Public Health in Colonial Bengal 1921-47*, Calcutta, K.P. Bagchi & Co., 1998.
13) Mark Harrison, *Public health in British India: Anglo- Indian Preventive Medicine 1859-1914*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
14) W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal Vol. IX*, District of Murshidabad and Pabna, Trubner & Co., London, 1876.
15) L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, Government of Bengal, Calcutta, 1914.